

📖 যুব-সমস্যা ও তার শরয়ী সমাধান

বিভাগ/অধ্যায়ঃ যুবক ও অনুকরণ-প্রবণতা

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ আবদুল হামীদ ফাইযী

যুবক ও অনুকরণ-প্রবণতা - ২

এই যে জীবন-জ্বালা, সামাজিকতা-বিহীন এই যে সমাজ, আর রক্তের মায়া-মমতাশূন্য এই যে যান্ত্রিক জীবন, সেই জীবনকে, সেই শূন্যতাকে, সেই একাকীত্বকে দূর করার জন্য তারা বিনোদন-বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে জীবনকে ভরে তুলতে চায়। ভালো-মন্দ বাছ-বিচার করে দেখার ফুরসৎ তাদের নেই, সেই প্রয়োজন আছে বলেও তারা মনে করে না। ভোগের জন্যই তাদের চিত্তের প্রয়োজন। তাই চিত্ত আর ভোগের পিছনেই তারা ছুটে। এই বিভ্রান্তি দিয়ে তারা চিত্তকে সব সময় আনন্দে ডুবিয়ে রাখার চেষ্টা করে থাকে। ওদের বিভ্রান্তি আছে, আর আছে বিভ্রান্তিকে চিত্তবিনোদনের জন্য ব্যবহারের মনটাও। দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত দৌলত আছে তাদের। দেহের রঙটাও লালচে সফেদ।

আমাদের মত কালো আদমীর মুগ্ধ হওয়ার, বিমোহিত হওয়ার, এমন কি সম্মোহিত হওয়ার জন্য যা কিছু তাদের থাকা দরকার, সবই আছে। তারা যা করে তাই আমাদের ভালো লাগে। ১৭৫৭ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত এই সাদা চামড়ার মানুষদের প্রভু জ্ঞান করে আমরা ধন্য হয়েছি। এ জন্য রাজনৈতিক দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করলেও সাংস্কৃতিক দাসত্ব থেকে মুক্তির কখনো চেষ্টা করিনি। কারণ, জাতে ওঠার জন্য এই বন্ধনকে কখনো ছিন্ন করিনি। বরং আরো বেশী মজবুত করেছি। তাদের জাত-গোষ্ঠী সবাইকে আমরা আমাদের সাংস্কৃতিক প্রভু বলে স্বীকার করে নিয়েছি।' (দেখুন, অপসংস্কৃতির বিভীষিকা, জহুরী ১৪- ১৬পৃঃ)

আমরা আমাদের অজান্তেই পশ্চিমের পদলেহী গোলাম হয়ে পড়েছি। আজ তাদের সামান্য অনুগ্রহ লাভ করার জন্য আমরা আমাদের হাব-ভাবে ফুটিয়ে তুলছি যে, আমরা তাদেরকে মন থেকে ভালোবাসি। তাই স্বকীয়তা বিকিয়ে, স্বাভাব্য বিলীন করে চেষ্টা করি তাদের পদসেবা করার।

ইসলামে তুমি দিয়ে কবর

মুসলিম বলে কর ফখর

মুনাফিক তুমি সেরা বেদ্বীন,

ইসলামে যারা করে যবেহ

তুমি তাহাদের হও তাবে'

তুমি জুতা-বহা তারও অধীন।

তবে হ্যাঁ, বেদ্বীন প্রতিবেশী ও জাতির সহিত দেশীয় মিল থাকতে পারে, পার্থিব লেনদেনে যোগাযোগ থাকতে পারে, সদাচার ও সদ্ভাবহার থাকতে পারে। তা বলে নিজের স্বাভাব্য বিকিয়ে দিয়ে একাকার হওয়া চলে না।

আমাদের দ্বীন ও শরীয়ত যে সব বিষয়ে বিজাতির অনুকরণ করতে নিষেধ করে, তার মধ্যে একটি বিষয় হল, আকীদা ও বিশ্বাসগত বিষয়। অর্থাৎ, তারা যে শিকী ও কুফরী বিশ্বাস রাখে, সে বিশ্বাস কোন মুসলিম রাখতে

পারে না। যে কুফরী মতবাদে তারা বিশ্বাসী সে মতবাদে কোন মুসলিম বিশ্বাসী হতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ ঈদ ও পাল-পার্বণ উৎসব উদ্‌যাপন ও অনুষ্ঠানগত বিভিন্ন বিষয়। অর্থাৎ, দুই ঈদ ছাড়া কোন মুসলিম ওদের দেখাদেখি আর কোন তৃতীয় ঈদ আবিষ্কার করতে পারে না; চাহে তা কোন দুর্বল বা জাল হাদীস-ভিত্তিক হোক, অথবা নিছক মনগড়া। বলাবাহুল্য, শবে মিরাজ, শবে বরাত, মুহররম, নবীদিবস বা ঈদে-মীলাদুননবী ফাতেহা ইয়াযদহম, ফাতেহা দোয়াযদহম, আখেরী চাহারশোম্বা, পৌষপার্বণ, সিলভার জুবিলি, গোল্ডেন জুবিলি, জাতীয় দিবস, মসজিদ সপ্তাহ, জন্মদিন বা হ্যাপি বার্থ ডে' উৎসব, হানিমুন, বিবাহবার্ষিকী, মৃত্যুবার্ষিকী, উরস-উৎসব, এপ্রিল ফুল, হ্যালোইন উৎসব, নতুন খাতা বা নববর্ষ প্রভৃতি অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন ইসলামে ভিত্তিহীন এবং পরের দেখাদেখি আনন্দে ফুটি করার মাধ্যম মাত্র।

এ সব ঈদ বা পরব পালন কোন মুসলিম করতে পারে না। যেমন ঐ শ্রেণীর কোন উৎসবে অথবা বিজাতির কোন পাল-পার্বণে কোন মুসলিম অংশগ্রহণ করে খুশী করতে পারে না। কারণ, বিজাতির সকল ঈদ ও ইবাদত বাতিলকে ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। আর তাদের সেই ঈদের খুশীতে শরীক হওয়া বা সে উপলক্ষ্যে তাদেরকে 'মোবারকবাদ' পেশ করার অর্থই হল তাদের বাতিলকে স্বীকৃতি দেওয়া ও সমর্থন করা এবং আসল সত্যের অপলাপ করা। বর্তমানে বিজাতির অনুকরণে মুসলিমদেরও পরব সংখ্যা এত বেশী হয়েছে যে, তা পালন করে মনে না রাখলেও অনেক সময় ঠকতে হয়। ধর, পাড়া-গ্রাম থেকে শহরে গেলে কোন অফিসের কাজে অথবা ব্যাংকে লেনদেনের কাজে। হঠাৎ দেখলে, সে অফিসে বা ব্যাংকে তালা ঝুলছে। সুতরাং এত কষ্ট করে এসে তোমাকে ঠকতে হল। এ ছাড়া ঠকানির পরিমাণ আরো বৃদ্ধি পাবে তখন, যখন পাশের কোন পরব-মানা মুসলিমকে এ বন্ধের কারণ জিজ্ঞাসা করবে এবং সে অবাক হয়ে বিদ্রূপের আগ্ন জিভে তোমাকে বলবে, 'ওঃ! মুসলিম হয়ে দাড়ি রেখে নিয়েছ বেশ। আর পবিত্র ও পরবের দিনের খবর রাখ না!' ইত্যাদি।

একদিন এক শহরের বাসস্ট্যাণ্ডে বাসে বসে ছিলাম। পাশের সিট ছিল খালি। এমন সময় আমার পরিচিত এক হাই-স্কুলের শিক্ষক মহাশয় বাসে উঠলেন। সালাম জানালে আমি উত্তর দিয়ে তাকে সাদরে পাশের সিটে বসতে অনুরোধ করলাম। তিনি খুশীর সাথে বসলেন। এরপর হঠাৎ করেই আমি তাকে জিজ্ঞাসা করে বসলাম, মার্কেট এসেছিলেন, আপনার আজ স্কুল নেই নাকি? তিনি অবাক হয়ে বললেন, 'আপনি জানেন না; আজকে ফাতেহা ইয়াযদহম, স্কুলের ছুটি?' আমি খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়েই বললাম, 'ও তাই বুঝি? আচ্ছা এই ফাতেহা ইয়াযদহম'টা কি?

তিনি যেন আরো অবাক হলেন। আসল প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে বড় আফশোসের সাথে বললেন, এই তো মুসলমানদের অবস্থা! নিজেদের পালপার্বণেরও খবর রাখে না। আজ তো হযরত বড় পীরের মৃত্যু-দিবস।

এরপর অবশ্য প্রসঙ্গ পাল্টাতে বলেছিলাম, 'মুসলমানরা যদি নিজেদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সঠিক মতে জানত, তাহলে সত্যি তাদের এ দুরবস্থা হতো না। কিন্তু আজকাল আসল ছেড়ে দিয়ে নকল হীরা নিয়েই টানাটানি বেশী। মনে মনে ভাবলাম, কুঁড়ে চাষীই অমাবশ্যা খুঁজে বেশী। আর কাজ-চোর বউই ভাঙুর মানে অধিক। নিজের ফরয আদায় থেকে যারা যত বেশী রেহাই পেতে চায়, তাদেরই এসব নকল পালপার্বণের খোঁজে ছুটি পাওয়াটা অধিক আকাংখিত। তাছাড়া যারা নামাযে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়ে না, বরং নামাযই পড়ে না, তাদেরই ফাতেহা বা ফয়তা নিয়ে বেশী খোঁজখবর ও বাড়াবাড়ি। বিজাতির অনুকরণের ফসল এই বারো মাসে তেরো পরব।' বাপকে জীবনে চোখে না দেখতে পেরে অথবা তার অবাধ্য সন্তান হিসাবে জীবন অতিবাহিত করে অথবা জীবিত অবস্থায় তার বিরোধিতা করে তার মৃত্যুর পর তার নামে ফয়তা দেওয়া হাস্যকর নয় কি?

পরন্তু আসল কথা এই যে, দ্বীনের মূল কর্মকর্তব্য বর্জন করে এই সমস্ত নকল পালপার্বণ সৃষ্টি করে একটু আনন্দ উপভোগ করাই হল এক শ্রেণীর স্বার্থপর মানুষদের উদ্দেশ্য। তাই দেখা যায় উহুদ-যুদ্ধের দিনকে স্মরণ করে অনেকে হালোয়া বানিয়ে খায়। কারণ, ঐ দিনে মহানবী রঃ এর দাত-মুবারক শহীদ হয়েছিল এবং মা-ফাতেমা তাঁকে হালোয়া বানিয়ে খেতে দিয়েছিলেন। অতএব ঐ দিনে হালোয়া খাওয়া সুন্নত। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, ঐ শ্রেণীর মানুষরা দাত ভাঙ্গা (জিহাদ) কে (ফরয তো দুরের কথা) সুন্নত মনে করে না। অথচ অক্ষত দাতে হালোয়া খাওয়াকে সুন্নত মনে করে। এটা স্বার্থপরতা নয় তো কি?

দুঃখের বিষয় যে, বিজাতির দেখাদেখি এক শ্রেণীর মুসলিম যুবক; যাদের বাপের পকেটে পয়সা নেই, তারা জোর-জুলুম করে অপরের নিকট থেকে চাঁদা তুলে মহরমের পরবে ফুর্তিআমোদ করে থাকে। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষের গাড়ি থামিয়ে এমন চাঁদাবাজি তথা ঐ অর্থ দ্বারা না হলেও ১০ই মহরমের দিন কোন প্রকার আনন্দ অথবা শোকপালন করা ইসলামী শরীয়ত-বহির্ভূত কর্ম। যেমন বিজাতীয় সহপাঠীদের চাঁদা তুলে কোন পূজা বা জন্ম-বার্ষিকী পালন করতে দেখে মুসলিম ছাত্রদেরও অনুরূপ নবী-দিবস পালন করা ইসলামী শরীয়ত-সম্মত নয়। প্রতিবেশীর সাথে পাশ্চাত্য দিয়ে এমন কাজ মুসলিমদের জন্য সত্যি লজ্জাকর।

বলাই বাহুল্য যে, ইসলাম হল খাটি একত্ববাদের ধর্ম। এ ধর্মে কোন প্রকার ব্যক্তিপূজা (মূর্তিপূজা, দুর্গাপূজা), শক্তিপূজা, অর্থপূজা এবং এক কথায় একমাত্র মহান আল্লাহর ইবাদত ও দাসত্ব ছাড়া অন্য কোন পূজার স্থান নেই। ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানরা আশ্বিয়াগণের কবরসমূহকে মসজিদ (সিজদার জায়গা) বানিয়ে নিত। ইসলাম এ ব্যাপারেও তাদের অনুকরণ করতে নিষেধ করল। কবর ও মাজার পূজার বিরুদ্ধে ইসলামের ঘোষণা এল, “তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিরা তাদের নবীগণের কবরসমূহকে মসজিদে পরিণত করেছে। সাবধান! খবরদার তোমরা কবরগুলোকে মসজিদে পরিণত করে নিও না। আমি এ করতে তোমাদেরকে নিষেধ করে যাচ্ছি।” (মুসলিম ৫৩২ নং) “আল্লাহ ইয়াহুদী জাতিকে ধ্বংস করুক; তারা তাদের আশ্বিয়াগণের কবরসমূহকে মসজিদে পরিণত করেছে।” (বুখারী ৪৩৭ নং)।

“ওরা হল এমন জাতি; যারা তাদের কোন নেক বান্দার মৃত্যু হলে তার কবরের উপর মসজিদ তৈরী করেছে এবং তাতে তার ছবি বা মূর্তি স্থাপন করেছে। ওরাই হল আল্লাহর নিকট সবচাইতে নিকৃষ্টতম সৃষ্টি।” (বুখারী ৪২৬, মুসলিম ৫২৮ নং)। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, বর্তমান বিশ্বে অধিকাংশ মুসলিম বিজাতির অনুকরণে ঐ শ্রেণীর পূজায় লিপ্ত হয়ে পড়েছে এবং তওহীদের ধর্মে ইবাদত ও বন্দেগীতে অন্যকে আল্লাহর শরীক অথবা মাধ্যমরূপে পূজতে শুরু করেছে। যে গায়রুল্লাহর ইবাদত (পূজা) নির্মূল ও উচ্ছেদ করার জন্য এ ধরাধামে ইসলামের আবির্ভাব ছিল, সেই ইবাদত (পূজা)কেই অভীষ্ট লাভের অনন্য উপায় বলে বরণ করে নিল মুসলিম জাতির বহু কুলাঙ্গারদল! আল্লাহ এ জাতিকে সুমতি দিন। আমীন। ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানরা রোযা রাখে, কিন্তু সেহরী খায় না। ইসলাম তাদের অন্ধ অনুকরণ করে। সেহরী খাওয়া ত্যাগ করতে নিষেধ করল। (মুসলিম ১০৯৬ নং) রোযা রাখার পর ওরা ইফতার করে, কিন্তু বড় দেরী করে। ইসলাম তাদের অনুকরণ বর্জন করতে নির্দেশ দিয়ে সূর্য ডোবার। সাথে সাথে সত্বর ইফতার করতে মুসলিম জাতিকে উদ্বুদ্ধ করল। (আবু দাউদ ২৩৫৩, ইবনে মাজাহ ১৬৯৮ নং, হাকেম ১/৪৩১)

সূর্যপূজকরা সূর্যের উদয় ও অস্তের সময় তার পূজা করে থাকে। তাই ঐ সময়ে আল্লাহর উদ্দেশ্যেও নামায পড়াকে ইসলাম নিষিদ্ধ ঘোষণা করল। (মুসলিম ৮৩২নং) যাতে মুশরিকদের সাথে তওহীদবাদী মুসলিমদের কোন প্রকার সাদৃশ্যভাব না ফুটে ওঠে। বৈরাগ্যবাদ বিজাতীয় আচার। ইসলামে তা নিষিদ্ধ হল। (আবু দাউদ ৪৯০৪ নং)

‘বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তি সে আমার নয়,

অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়

লভিব মুক্তির স্বাদ----।

ইসলামের এ আদর্শ হল মানব-প্রকৃতির জন্য অতুলনীয়। সুতরাং মাছ-গোশু না খাওয়া, জুতো না পরা, গাড়ি না চড়া, ইত্যাদি বিজাতীয় আচরণ, ইসলামী আচরণ নয়।

ইসলামে দলাদলি ও ফিকাবন্দী নিষিদ্ধ কর্ম। কারণ, এ আচরণ ও নীতি হল মুশরিক ও কাফেরদের। তাদের সমাজেই আছে ভেদাভেদের নানা প্রাচীর। উঁচু-নীচু পার্থক্য করার মনগড়া নানা দোষগুণ। মহান আল্লাহ বলেন, “তোমরা তাদের মত হবে না, যারা তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন আসার পরও বিচ্ছিন্ন হয়ে (দলে দলে বিভক্ত হয়ে) পড়েছে এবং নিজেদের মাঝে মতান্তর সৃষ্টি করেছে।” (সরা আ-লি ইমরান ১০৫ আয়াত)।

বিজাতীয় মানুষকে ঘৃণা করে নয়, বরং বাতিল থেকে হকের যে একটা পৃথক বৈশিষ্ট্য আছে তা প্রকাশের জন্য এবং মুসলিম বাতিলের সাথে কোন প্রকার আপোসে সম্মত নয়, তা জানিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই লেবাসে-পোশাকেও সে অন্যান্য জাতি থেকে ভিন্ন। পরিচ্ছদ-পরিধানেও মুসলিমের আছে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। যেমন, মুসলিমের লেবাসে প্রকাশ পায় না কোন প্রকার অহংকার-অহমিকা, পাওয়া যায় না কোন বিজাতীয় গন্ধ, থাকে না কোন প্রকার দৃষ্টিকটুতা, অশ্লীলতা ও বেলেজ্ঞাপনার ভাব। আর এ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলা তার একান্ত কর্তব্য। একদা মহানবী (সা.) আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ)-কে দু’টি জাফরান রঙের কাপড় পরে থাকতে দেখে বললেন, “এ ধরনের কাপড় হল কাফেরদের। অতএব তুমি তা পরো না।” (মুসলিম আহমাদ ১১৬২)

এ থেকে বুঝা যায় যে, যে ধরনের লেবাস-পোশাক বিজাতির বিশেষ প্রতীক তা কোন। মুসলিম নর-নারী ব্যবহার করতে পারে না।

পুরুষের এক প্রকৃতি-সুন্দর রূপ হল তার চেহারা দাড়ি। কুদরতের দেওয়া এই দাড়ি থাকলে মুসলিমকে দেখতে যেমন সুন্দর লাগে, তেমনি চাছা-ছিলার ঝামেলা থেকে রেহাই পায়। তাছাড়া বিশেষ করে গালে টোল পড়ার বয়সে টোলের ক্রটি দাড়ি দিয়ে গোপন করা যায়। এতে থুড়থুড়ে হলেও চেহারা বেশ শ্রদ্ধাপূর্ণ সুন্দর দেখায়। তবে শর্ত হল দাড়ি ছাড়ার সাথে মোছ ঘেঁটে ফেলতে হবে। নচেৎ সুন্দরের উপর অসুন্দর বেখাপ্পা দেখাবে। আর এমন চেহারা হবে মুসলিমের বৈশিষ্ট্য। প্রিয় নবী স. বলেন, “তোমরা মোছ হেঁটে ফেল এবং দাড়ি ছেড়ে দাও (কমপক্ষে এক মুঠো পরিমাণ)। আর একাজ করে তোমরা মুশরিকদের অন্যথাচরণ কর।” (বুখারী ৫৮৯৩, মুসলিম ২৫৯ নং) “মোছ ছেটে ও দাড়ি রেখে অগ্নিপূজকদের বৈপরীত্য কর।” (মুসলিম ২৬০ নং) “এবং ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানদের সাদৃশ্য অবলম্বন করো না।” (আহমাদ, সহীহুল জামে ১০৬৭ নং)

আর তা এই জন্য যে, ওরা কেউ আমাদের মত হতে চায় না, আমাদের কাছে আসা সত্যকে গ্রহণ করতে চায় না, তাই আমরা তাদের বাতিল চলনের বিরোধিতা করতে আদিষ্ট হয়েছি।

অনেক যুবকের অবস্থা উল্টা বুঝিল রাম। অর্থাৎ, তারা দাড়ি চেঁছে ফেলে মোছ লম্বা ছেড়ে মোছাল সেজে সোঁপে পাক দেয়। কারো বা টাঙ্গি মোছ! কারো বা হাফ-দাড়ি মোছ বা জুলফি-জোড়া মোছ। কারো বা দাড়ি-মোছ একেবারেই ছিল! এরা সকলেই মহানবী ও ও তার অনুসারীদের বিরোধী। অনেকের দাড়ি আছে, তবে তা মহানবীর অনুকরণে নয়; বরং তা হয়তো লেনিন বা কার্লমার্কসের অনুকরণে, নচেৎ কোন প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব বা

হিরোর অনুকরণে। যার দরুণ তাদের দাড়ি-মোছ ইসলামী ছাঁচ বা কাটিং মত নয়। ফ্যাশন মনে করে রাখে, এক সপ্তাহে ছাঁটে, পরের সপ্তাহে চাছে। কাউকে ছাঁটতে বা চাছতে নিষেধ করলে বুকের দিকে ইঙ্গিত করে বলে, “ঈমান তো এখানে!” অর্থাৎ, দাড়িতে নয়। কিন্তু তার জানা নেই যে, ঈমানের মূল আছে অন্তরে, আর তার কাভ ও শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন অঙ্গে ও কর্মে। সুতরাং দাড়ি রাখাও হল ঈমানের এক শাখা এবং তা ওয়াজেব।

পক্ষান্তরে আর এক শ্রেণীর লোক আছে, যারা মুসলিমকে ধোকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে মেকি দাড়ি রাখে। এরা দুইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। চুল-দাড়ি পেকে সাদা হয়ে গেলে সাদাই রেখে দেওয়া বিজাতীয় আচরণ। তাই ইসলামের আদেশ হল, তা কালো ছাড়া অন্য কোন রঙ দ্বারা রঙিয়ে ফেল এবং বিজাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করো না। (বুখারী ৩৪৬২, মুসলিম ২১০৩ নং, আহমাদ, ত্বাবারানী, সহীহুল জামে’ ১০৬৭, ৪৮৮৭ নং)

মহিলাদেরকে বেপর্দায় রাখা হল জাহেলী যুগের মানুষদের অনুকরণ। (সূরা আহযাব ৩৩ আয়াত) বরং বর্তমান বিশ্বের সমগ্র জাতির অন্ধ অনুকরণ হল মহিলাদের আকর ও পর্দাহীনতায় বেগানা পুরুষের সামনে যাওয়া। মাথায় পরচুলা ব্যবহার ইয়াহুদী মেয়েদের আচরণ। অতএব তা কোন মুসলিম নারী ব্যবহার করতে পারে না। (মুসলিম ২৭৪২ নং) কেউ এলে তার জন্য দাঁড়িয়ে সম্মান জানানো; যেমন, কোর্টে হাকীমদের জন্য, পার্লামেন্টে স্পীকার মন্ত্রীদেবর জন্য, স্কুল-কলেজে শিক্ষকদের জন্য অথবা কোন আলেম-বুযুর্গের জন্য উঠে দাঁড়িয়ে তা’যীম প্রকাশ করা বিজাতীয় আচরণ। কোন মুসলিমের জন্য তা বৈধ নয়। (মুসলিম ৪১৩, আবু দাউদ ৫২৩০ নং প্রমুখ) বৈধ নয় কোন মৃত বা তার আত্মার উদ্দেশ্যে কয়েক মিনিট দাড়িয়ে নীরবতা পালনের সাথে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন। কারণ, এ প্রথাও বিজাতির নিকট থেকে ধার করা প্রথা।

গুরুজনদেরকে সালাম দেওয়ার সময় অনেকে প্রণামের অনুকরণ করে তাদের পা ছুঁয়ে সে হাত কপালে ও বুকে ঠেকিয়ে সম্মান জানায়। এ ছাড়া এই সালামে অনুপ্রবেশ করেছে আরো অনেক কিছু বিজাতীয় কায়দা।

ইসলামে এক মুসলিম অপর মুসলিমকে সাক্ষাৎ করলে যে অভিবাদন আছে, তা অন্য কোন জাতির নেই। একই সঙ্গে অভিবাদন, দুআ ও কল্যাণ কামনা অন্য কোন শব্দ ও ভাষাতে নেই। সুপ্রভাত, শুভসন্ধ্যা, নমস্কার আর যাই বলুন না কেন সালাম-এর সমতুল কিছুই নয়। তবুও যেন এই অতুল শব্দগুচ্ছের অভিবাদনকে পরিহার করে মুসলিম পরিবেশেও ইংরেজী কায়দায় ‘গুড মর্নিং’ গুড এভেনিং’ প্রভৃতি বলে পশ্চিমী ধারায় সালাম জানানো হয়, সৈনিক পর্যায়ে সেলুট করা হয় ঐ একই কায়দায়। মৃতব্যক্তিকেও শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করা হয় ঐ পশ্চিমী ছাঁচে। ইংরেজ কালচারের জয়-জয়কার যেন সর্বত্র। পোশাকেই বলুন, চাল-চলনেই বলুন, আর তাদের বুলি-বচনের কথাই বলুন, আমরা হাতে-কলমে প্রাত্যহিক কাজ-কর্মে এই প্রমাণই রাখছি যে, আমরা তোমাদের ছিলাম, তোমাদেরই আছি। এবং তোমাদের হয়েই থাকব।’ (অপসংস্কৃতির বিভীষিকা ২৪পৃঃ)

মহানবী (সা.) বলেন, “যে ব্যক্তি আমাদেরকে ছেড়ে অন্যের অনুকরণ করে, সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়। তোমরা ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানদের সাদৃশ্য অবলম্বন (অনুকরণ) করো না। ইয়াহুদীদের সালাম হল আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করা এবং খ্রীষ্টানদের সালাম হল হাত দ্বারা ইশারা করা।” (তিরমিযী ২৮৪৮, সিলসিলাহ সহীহাহ ২১৯৪নং)*

বলা বাহুল্য যে, পোশাকে আমরা যা ব্যবহার করি, তা ওদেরই দেখে শেখা; যাতে বসে পেশাব করা যায় না, ইদ্দত যথার্থরূপে গোপন হয় না, গাটের নীচে বুলিয়ে না পরলে ফ্যাশন। জমে না। আর আমাদের স্ত্রী-কন্যা-বোনদেরকে যা পরিয়েছি তাও ঐ ‘ম্যাডাম’দের অনুকরণ। আলোকপ্রাপ্ত করার উদ্দেশ্যে যথা সম্ভব তাদের উন্মুক্ত হাঁটুতে, জাপ্টে, বুকে, মাথায়, পিঠে ও নাভিতে সূর্যের আলো দিয়ে থাকি।

অনেকে বাড়িতে কুকুর পুষতে শুরু করেছে ওদের দেখাদেখি। বিবাহের পূর্বে কোর্টশীপ বা বর-কনের অবাধ মিলন ও হৃদয়ের আদান প্রদান, পয়গাম বা বাদানের সময় পয়গামের আংটি পরাবার প্রথা ইত্যাদিও ওদের নিকট থেকে অনুপ্রবেশ করেছে আমাদের সমাজে। নাম রাখতেও অনুকরণ করা হচ্ছে বিদেশী কায়দার। অমুসলিমরা কোনদিন ভুল করেও নিজেদের ছেলে-মেয়েদের মুসলমানী নাম রাখে না। অথচ মুসলিমরা এ কাজ বড় গর্বের সাথে ফ্যাশন মনে করে পালন করে থাকে।

আর এ সবার মূল কারণ হল, আজকের মুসলিম হীনম্মন্যতার শিকার। মানসিক আগ্রাসনের শিকার হওয়ার ফলে বিজাতীয় সব কিছুকে লুফে নিতে প্রগতি ধরে নিয়েছে। সাধারণতঃ যে দুর্বল হয়, সে হয় প্রভাবশীল। আর সবল হয় প্রভাবশালী। মুসলমান মানসিক দুর্বলতার শিকার হয়ে নিজেকে প্রভাবশালী না করে প্রভাবশীল করে ফেলেছে।

ইসলাম আসার পূর্বে জাহেলী যুগ ছিল অন্ধ মূর্খতার যুগ। ভ্রষ্টতার অন্ধকার ছিল ঘন কালো হয়ে মানুষের মনে ও সমাজে। সে যুগের সেই অসভ্যতার কৃষ্ট তমসচ্ছন্ন বিভাবরী ভেদ করে সভ্যতার সূর্য উদিত করল ইসলাম। দূর হল মুখতা ও ভ্রষ্টতার অন্ধকার, অপসৃত হল মনের কালো। নিন্দিত হল জাহেলিয়াতের সকল কর্ম। সুতরাং সে সব কর্ম ও প্রথা কোন মুসলিম যে গ্রহণ করতে পারে না, তা বলাই বাহুল্য। জাহেলী প্রথা যেমন, মৃতব্যক্তির জন্য মাতম করে শোক পালন করা, মর্সিয়া গাওয়া, বংশ নিয়ে গর্ব করা, অপরের বংশে খোটা দেওয়া, রাশিচক্রে বিশ্বাস রাখা, (মুসলিম ৯৩৫ নং) নিজের দেশ, ভাষা, মযহাব, গোত্র, রঙ, বর্ণ প্রভৃতিতে অন্ধ-পক্ষপাতিত্ব করা ইত্যাদি।

সকল মুসলিম ভাই-ভাই। তাদের মাঝে ভেদাভেদের কোন প্রাচীর নেই। বর্ণ-বৈষম্যের অভিষাপ থেকে মুসলিম সমাজ সম্পূর্ণ মুক্ত। এ সমাজের সকলেই সমান অধিকারের দাবিদার। “সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ হল সেই ব্যক্তি, যে সব চেয়ে বেশী মুত্তাকী ও পরহেযগার।” (সূরা হুজুরাত ১৩ আয়াত) এমন কিছু আচরণ আছে যা মানুষের নয়, শয়তানের। মুসলিম শয়তানের অনুকরণ করে সে সব আচরণ করতে পারে না। যে শয়তান, তার সকল কর্ম শয়তানীতে ভর্তি। এমন কি আপাতঃদৃষ্টিতে যে কাজ মুসলিমের জন্য ভালো মনে হয় সে কাজ শয়তানের তরফ থেকে হলে জানতে হবে ঐ ভালোর মাঝে কোন কালো ভরে ফেলেছে, অপেক্ষাকৃত কোন বড় ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে।

অতএব শয়তানের শয়তানীতে অনুকরণ করা কোন মানুষের জন্য শোভনীয় হতে পারে না। বাম হাতে খাওয়া-পান করা এক শ্রেণীর মানুষের ফ্যাশন। ডান হাতে চা, বাম হাতে বিস্কুট, অথবা ডান হাতে পেঙ্গি বা জুস এবং বাম হাতে কেক ইত্যাদি খেয়ে তারা আধুনিকতা প্রদর্শন করে থাকে। অথচ পাশ্চাত্যের অনুকরণে এ আধুনিকতা ও ফ্যাশন হল আসলে শয়তানের। মহানবী বলেন, “তোমাদের মধ্যে কেউ যেন তার বাম হাতে পানাহার না করে। কারণ, শয়তান তার বাম হাত দিয়ে পানাহার করে থাকে।” (মুসলিম ২০১৯, তিরমিযী, সহীহুল জামে ৭৫৭৯ নং)

অনেক যুবক অহংকার প্রদর্শন করে ঔদ্ধত্যের সাথে বলে, বাম হাতের দোষ কি? সে হাতে খেলে ক্ষতি কি? আর তারা হয়তো এ কথাও বলে, ডান হাত লাটসাহেব নাকি? সে হাত দিয়ে পায়খানা সাফ করলে ক্ষতি কি? কিন্তু ফলকথা হল এই যে, রুচি যখন বিকারগ্রস্ত হয়, তখন স্বাদ পার্থক্য করার মত ক্ষমতাও আর থাকে না এক শ্রেণীর রোগীর কাছে। অবশ্য এমন রোগীর সত্ত্বর চিকিৎসা করা যে জরুরী, তা হয়তো বলা নিস্প্রয়োজন। লেবাসে-পোশাকে, চলনে-বলনে, ভাবে-ভঙ্গিতে আচরণে-প্রসাধনে নারী-পুরুষের একে অন্যের অনুকরণ করা এক চারিত্রিক দোষ। দাড়ি-মোছ চেঁছে, চুল লম্বা রেখে, ছাপা লুঙ্গি-জামা পরে, গাঁটের নীচে মাটিতে পরিহিত কাপড় ঝুলিয়ে, পাউডার মেখে, হাতে বালা, গলায় সোনার হার ইত্যাদি পরে মহিলাদের অনুকরণ করে থাকে এক শ্রেণীর

‘লারেলাপ্লা’ মার্কা যুবক।

পক্ষান্তরে চুল হেঁটে ছোট করে, পরিহিত কাপড় গাটের উপর, বরং হাঁটুর উপর তুলে, প্যান্ট-শার্ট পরে, অঙ্গ-ভঙ্গিতে পুরুষের মত গটগট করে চলে এক শ্রেণীর আধুনিক ‘ম্যাডাম’-এর দল। যাদেরকে পিছন থেকে দেখলে কোন দর্শক সহজে ঠাণ্ডর করতে পারে, সামনে ওটা ছেলে চলল, না মেয়ে? প্রাকৃতিক নিয়মের নিয়ামক নারী-পুরুষের মাঝে বড় পার্থক্য রেখেছেন। যা অস্বীকার করলে এবং নারী-পুরুষকে সকল ময়দানে একাকার করে। দিলে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় সমাজে যে উচ্ছলতা ও অনৈতিকতা তথা অশান্তির ঝড় দেখা দেবে, তা বহু সমাজ-বিজ্ঞানী স্বীকার করেছেন।

যুগের ধর্ম এই

বারুদে-আগুনে একই করিলে জ্বালাইবে তোমাকেই।

ফুটনোট

* প্রকাশ থাকে যে, যেখানে শব্দ পৌছবে না এমন জায়গার কোন লোককে অথবা দূরের কাউকে সালাম দিলে হাত দ্বারা ইশারা করে তা জানানো দুঃখনীয় নয়। তবে শর্ত হল, ইশারার সাথে মুখে সালাম উচ্চারণ অবশ্যই করতে হবে।

Source — <https://www.hadithbd.com/books/link/?id=12469>

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন